সন্ত্রাসের শিকড় সন্ধান ও প্রতিকার

অতনুশাসন মুখোপাধ্যায়

সন্ত্রাসের অর্থ সন্ত্রাস, সন্ত্রাসবাদী ইত্যাদি শব্দ সাধারণত আভিধানিক অর্থেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু এ ব্যাপারে একটা সূক্ষ্ম অনুভূতি থাকা প্রয়োজন। মনে রাখা প্রয়োজন কে কার চোখে সন্ত্রাসবাদী সেটা বিশেষ কিছু দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভরশীল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করতে যাঁরা জীবনপণ করেছিলেন ইংরেজের চোখে তাঁরা সন্ত্রাসবাদী, কিন্তু আমাদের চোখে বীর।

সন্ত্রাসের চরিত্র নির্ণয় -- প্রতিকারের প্রথম পদক্ষেপ

সুতেই মেনে নিতে হবে সন্ত্রাসের প্রতিকার রাষ্ট্রের বিবেচনাধীন বিষয়। যে- কোনো রাষ্ট্র বা নেশন-- সে গণতান্ত্রিকব্যবস্থায় পরিচালিত হোক বা অন্য প্রক্রিয়ায়, তার রাষ্ট্রীয় লক্ষ্যসমূহ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বদলাতে পারে কিন্তু সেই বদল কোনো অবস্থাতেই সেই রাষ্ট্রের অখণ্ডতায় আঘাত হেনে নয়। আবার দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে সন্ত্রাস খতে হলে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারটাও অত্যন্ত গুত্বপূর্ণ। সন্ত্রাসের প্রতিকার ততদিন পর্যন্ত কঠিন হবে যতদিন না সুগঠিত এবং সুপরিচালিত সন্ত্রাসকদল নিজেরাই অনুধাবন করবেন আত্রমণাত্মক পথে ফল লাভের আশা ক্ষীণ। একটা দুভাবে সম্ভব। প্রথম, সন্ত্রাসদমনকারী শত্তি এতটাই প্রবল পরাত্রান্ত যে, সন্ত্রাসকদল সন্ত্রাস ছড়াতেই ভয় পাচ্ছেন। দ্বিতীয়, সন্ত্রাসকদল অনুভব করেছেন যাদের বিদ্ধে সন্ত্রাস সেই সরকার বা রাষ্ট্র পরিচালনকারীরা সদা সিদ্ধকাম না হলেও ঠগ, জোচ্চোর, অসাধু, হৃদয়হীন ব্যত্তিদের দ্বারা পরিচালিত অশুভ শত্তি নয়--- ফলত, হিংসার পথ পরিত্যজ্য।

প্রথম সম্ভবনা অতি স্বল্প মেয়াদে ক্বচিৎ যদি বা দৃশ্যমান হয় তার ধারাবাহিকতার স্বপ্ন দেখা আজকের বিজ্ঞান-প্রযুত্তির অগ্রগতির সর্বাঙ্গীন ব্যাপ্তি তথা আন্তর্জাতিক স্বার্থ, অর্থনীতি ও বাণিজ্যের ঘোলা জলের বিচিত্র তরঙ্গের নিরিখে একেবারেই অলীক ভাবনা। দ্বিতীয় সম্ভাবনাই সন্ত্রাসের প্রতিকারের দীর্ঘমেয়াদী গোড়া-মারা পথ বলে ধরে নেওয়া সমীচীন। কারণ, এক্ষেত্রে সন্ত্রাসকদল উপলব্ধি করতে পারেন, রাষ্ট্র পরিচালনায় দৃষ্টিভঙ্গির নমনীয়তা কঠিন বাঁধন ছাড়িয়ে একটা সীমা পর্যন্ত প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটাতে প্রস্তুত।

এখন প্র্ন, আভিধানিক অর্থে সন্ত্রাসবাদী কেন ‘uses or favours violent and intimidating methods of coercing a government or community?’ একটা বিজাতীয় বোধ থেকে কি ? জাতি প্রকৃত অর্থে কী? যেসরকার বা জাতিগোষ্ঠীর বিদ্ধে তার লড়াই, সে কেন নিজেকে তার অন্তর্গত মনে করে না? উত্তর খুঁজতে বহু পঠিতসেই ‘The Prince’ -এর দোরে মাথা না ঠুকে উপায় নেই। পঞ্চদশ- ষোড়শ শতাব্দীতে যখন ইতালীয়রা জাতীয়তা সম্পর্কে আদপেই ভাবিত নয়, ম্যাকিয়াভেলী মত প্রকাশ করলেন, ধর্ম এবং বিভিন্ন নীতির বিধিনিষেধ থেকে মুত্ত রাখতে হবে রাষ্ট্রকে। তাতেই জাতীয়তাবাদের উত্থান। তাঁর কথায়,“Where it is an absolute question of the welfare of our country, we must admit of no considerations of justice or injustice, of mercy or cruelty, or ignominy, but putting all else aside must adopt whatever course will save its existence and preserve its liberty.’

প্রথমেই খতিয়ে দেখা প্রয়োজন এমন রাষ্ট্র গড়তে কী লক্ষ্যপথ হওয়া উচিত। এমন দেশ রাষ্ট্র গড়া কি আদপেই সম্ভব ?

সমস্যা কোথায় ? পাশ্চাত্য ইতিহাস স্মরণ করলে দেখা যায়, ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে সে সময়ে ছিল একই ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বহু ভাষার সহাবস্থানের সমস্যা। রাজা ও রাষ্ট্র এই সমার্থক দুই ভাবনার সমস্যা। সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে এবং পরে ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের ফলে রাষ্ট্র রাজার রইল না, জনতার হল---জাতীয় রাষ্ট্র বা পিতৃভূমি বলে বিবেচিত হল। নতুন এক জাতীয়তাবোধে মতাদর্শের পার্থক্য ও বিভিন্নতার উপর সভ্যতার একটাপলেস্তারা পড়ল। পার্থক্য ও বিভিন্নতা নির্মূল হল না কিন্তু তখন পরস্পরের কাছে তা বিজাতীয় ঠেকল না। আদতে কিন্তু পাশ্চাত্যের ইতিহাস থেকে মারামারি, হানাহানির চিহ্ন মুছে গেল না। রোখা গেল না বিজাতীয় বোধের ফিরে ফিরে আসা। ভারবর্ষের মতো বহু ধর্ম, বহু ভাষা, বহু স্বার্থভারাত্রান্ত রাষ্ট্রে গোষ্ঠীস্বার্থের বিচারে বিজাতীয় বোধ নির্মূল করা অত্যন্ত কঠিন অথচ সর্বাধিক জরি কাজ।

এই বিজাতীয় বোধ ব্যাপারটার ভালোমতো বিশ্লেষণ প্রয়োজন কারণ সন্ত্রাসোদ্ভূত হানাহানি, লুঠতরাজ আর সাধারণ ডাকাতি-রাহাজানিঘটিত অস্থিরতায় আদর্শগত বিস্তর প্রভেদ। সন্ত্রাস চালিয়ে যাবার প্রয়োজনে সন্ত্রাসকদল ডাকাতি-রাহাজানির পথ অবলম্বন করে প্রায়শই অর্থ সংগ্রহ করে। কিন্তু ডাকাতদল নিজেদের ভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সদস্য মনে করে না যেটা সন্ত্রাসকদল অনেক সময়ই করে। ম্যাকাইভার এবং পেজ মানুষের এই ধরনের বিজাতীয়বোধের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন। ‘Man becomes socialized as the member of A group, first a very near group, the family or the kinsfolk, and then of a wider group, the local committee, the social class, the ethnic group, the nation. He learns to belong, but in learning to belong he learns also to exclude. He divides the people into the “we” and the “they’, the “in-group” and the “out-group”, His devotion to the “we” easily becomes dislike or hostility to “they”. His pride in the “we” is fostered by his contempt for the “they’. Thus group prejudice is developed on every scale of belonging, from the family to the nation and perhaps to the “race”—the ‘race” we belong to.

এ কথা বিশদভাবে বলার অপেক্ষা রাখে না, আজকের বিশ্বজোড়া সন্ত্রাসের মূল সমস্যাটাই এই ‘ভ্রন্দ্ব’ এবং ‘they’ বোধজনিত। সুতরাং এই সমস্যার সমাধান খুঁজতে লাগসই কিছু সূত্র ওপর ওপর খোঁজা---বর্ষাশেষে শহরের খোয়া ওঠা রাস্তায় আপাত প্রতিকার হিসাবে পিচ্‌- খোয়ার হাল্কা স্তর বিছোনোর মতোই ক্ষণস্থায়ী সমাধান।

রাষ্ট্র বিরোধ

সন্ত্রাসের সমাধান খোঁজের আগে যদি খতিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়, যাঁরা রাষ্ট্রের বা সরকারের বিদ্ধাচরণ করে হিংসার পথ বেছে নিয়েছেন তাদের চাহিদা কী কী, তার কতটা ন্যায্য দাবি, কতটা রাষ্ট্র বা সরকারের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব, প্রতিকারের উপায় খোঁজে তাতে সুবিধেজনক হতে পারে। পাশাপাশি অন্যায্য দাবি সমূহের খোলামেলা বিশ্লেষণে এবং অপূরণযোগ্য দাবি অপূর্ণ রাখার কারণ খোলামেলাভাবে রাষ্ট্র বা সরকারের পক্ষ থেকে বিশ্লেষিত এবং প্রচারিত হলে সন্ত্রাস বিষয়ে জনমত গঠিত হতে পারে। জনমতের জোরে কালত্রমে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে গোষ্ঠীর মধ্যে ভাঙন ধরা সম্ভব এবং হিংসার পথে অংশগ্রহণে গোষ্ঠীর এক পক্ষের অনীহা বিদ্ধশক্তির রূপ নিয়ে সন্ত্রাসের প্রতিকার রক্ষাকর্তার ভূমিকা পালন করতে পারে। রাষ্ট্রের এই ধরনের ইতিবাচক ভূমিকা সন্ত্রাসের মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক শক্তিজোট গড়ে তুলতে পারে এবং বৃহত্তর আন্তর্জাতিক পরিসরে আলোচনার মাধ্যমে সন্ত্রাসদমনে কাযকর ভূমিকা পালন করতে পারে। যদিও এই তত্ত্বগত সম্ভাবনা ব্যবহারিক দিক দিয়ে কতটা অর্থবহ হবে সে ব্যাপারেওএকটা প্রশ্ন থেকে যায়।

রাষ্ট্র বা সরকার জনমত গড়ে তোলার বিশ্লেষণমুখী খোলামেলা পথ পরিহার করে কড়া দমনকারীর ভূমিকা পালন করতে গেলে ‘we’এবং they’ এদের ব্যবধান বৃহত্তর হবে। নতুন নতুন‘we’ দল নিত্যনতুন দাবি নিয়ে প্রকাশ্য বা গোপনে আবির্ভূত হয়ে রাষ্ট্র, শাসনযন্ত্র এবং সাধারণ নাগরিকের জীবনে অস্বস্তি এবং অচলাবস্থা সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে। ‘we’ এবং ‘they’ বোধতাড়িত সন্ত্রাসবাদী হয় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রভিত্তির জাতীয়তার অন্তর্ভুক্ত থাকতে চায় না আইডেনটিটি বা বিশেষ পরিচয় খোয়া যাবার ভয়ে, নয়তো বিপরীত পক্ষে রাষ্ট্রের অতি গুত্বপূর্ণ শরিক হিসেবে নিজেদের

বিবেচনা করে শাসকশ্রেণী তাদের প্রতি অমনোযোগী এবং বৈরী মনোভাবাপন্ন এই উপলব্ধি থেকে সন্ত্রাস ছড়ায়। যাদের হাতে শাসনযন্ত্র তারা রাষ্ট্র পরিচালনায় অক্ষম ধরে নিয়ে তাদের ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছায় সন্ত্রাসবাদী তক্মা গ্রহণ করে। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদের শিকড় ওঠা বিশেষ একটা জাতীয়তাবোধের থেকে ভেঙে বেরোতে চায়, নয়, প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবোধকে এক ধরনের উগ্র জাতীয়তার নতুন বোধের জোয়ারে ভাসিয়ে দিতে চায়।

দেশজ এবং আমদানিকৃত সন্ত্রাস

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, জাত-বর্ণ-ধর্ম সম্পর্কিত অশিক্ষা, কুশিক্ষা এবং অসহিষ্ণুতা সন্ত্রাস সৃষ্টির এক পক্ষের কারণ। অন্য পক্ষেরকারণ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, বেঁচে থাকার জন্যে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার অভাব এবং এসব থেকে জন্ম নেওয়া পর াধীনতার বোধ। এই দু ধরনের কারণই জন্ম নিতে পারে রাষ্ট্রের অভ্যন্তর থেকে যার পিছনে থাকে ঐতিহাসিক সত্য াসত্য। আবার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বণিক দুনিয়ার অভ্যুত্থানের পরে ব্যবসায়িক স্বার্থে সন্ত্রাসের এই কারণগুলো ভালো করে বুঝে নিয়ে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে সন্ত্রাসকদল সৃষ্টি করল কোনো স্বার্থান্বেষী শক্তি--এ ঘটনাও বিরল নয়। এই আমদা নিকৃত সন্ত্রাসের আলোচনা পরে। আপাতত, দেশজই হোক আর বাইরের থেকে আগতই হোক, যে যে বিষয়কে ঘিরে সন্ত্রাস উদ্ভূত হবার সম্ভাবনা তাদের গভীরে প্রবেশ করা যাক।

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, ধর্মীয় বিদ্বেষ ও বিভেদ

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে আর্থর দ্য গোবিন্যো জাতীয়তাবোধে রক্তের গুত্ব সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করলেন। তাঁর এই বিচিত্র অভিমত সে সময়ের সামাজিক অবস্থার সমর্থনে। সভ্যতার ব্যাপ্তি সীমিত। উচচ-নীচভেদে বৈষম্য। স্বভাবতই সৃষ্টিশীল চিন্তার প্রকাশ উচচবর্ণের মধ্যেই ঘটত। এই সহজ সত্য তাঁর চোখে পড়ল না। তখনকার সমাজ ব্যবস্থায় বিব াহের ব্যাপারে উচচ-নীচ বিচারে কড়াকড়ি ছিল এবং টিউটোনিক বা জার্মান জাতির মনে এই কারণেই ছিল খাঁটি রক্তের অহমিকা তথা নেতৃত্বে স্বাভাবিক অধিকারবোধ। ফরাসি দেশে অ্যান্টি-সেমাইটদল ইহুদিদের ইয়োরোপ ভূখণ্ডে বাইরের লোক বলে হিহিত করল। ১৮৯৪ সালে আলফ্রেড ড্রেফুসের মৃত্যুদণ্ডাদেশের মধ্যে দিয়ে ইহুদিদের প্রতি অ্যান্টি-সেম াইটদের এই বিদ্বেষের চরম প্রকাশ ঘটল। ফরাসি সৈন্যবাহিনীর একমাত্র ইহুদি অফিসারের এই মৃত্যুদণ্ডে অ্যাংলো - স্য াক্সন, জার্মান এবং প্রোটেস্ট্যান্টদের ঘটানো। ড্রেফুস হত্যাকাণ্ডের দু বছর পরে অস্ট্রিয়ান সাংবাদিক থিওডোর হার্জল্ (Herzl) প্রচার করলেন--- যে জাতির ভূখণ্ড নেই তাদের জন্যে চাই মনুষ্যহীন ভূখণ্ড। এদিকে তার আগেই রাশিয়ায় জ ায়োনিস্ট্ দল (Zionist) নতুন জাতির অভ্যুত্থান ঘটাতে প্যালেস্টাইনের পথে পা বাড়িয়েছে। ততদিনে জার্মানিতে অ্যা ন্টি - সেমাইট দলের ভালোমতো প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে যার ফলশ্রুতি হিসাবে শ হয়ে গেছে ইহুদি - খেদাও আন্দোলন। ১৮৭৯ সালে ঐতিহাসিক হেনরিক ফন ট্রেটস্কি ‘The Jews are our misfortune’ নামে একটি জ্বালাময়ী নিবন্ধ রচন া করলেন। অথচ তার ষোল বছর আগে ১৮৬৩ সালে লুই জোলি ‘অন দ্য প্রিন্সিপল্ অব ন্যাশনালিটিজ’ গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, ‘The fusion of races, as it happened in France, Britain, and the United States, is one of the great beneficial factors of history. The leading powers in the world are the very ones where the various nationalities and racial strains which entered into their formation have been extinguished as far as possible and have left traces.’ অর্থাৎ, ইতিহাস থেকে এই শিক্ষাই পাওয়া যাচ্ছে একদল স্বপ্ন দেখে, শক-হূণদল-পাঠান-মোগল এক দেহে লীন হোক আর অন্যদল মদত দেয় বিভিন্নতা জাগিয়ে রাখায়। দ্বিতীয় দলের কারণে সন্ত্রাসের জন্ম আর প্রথম দলের প্ররোচনায় সন্ত্রাসের প্রতিকারের আশা ও ভাবনা।

ধর্ম বিষয়ে বিভেদ সন্ত্রাসের আলোচনায় অতি মাত্রায় গুত্বপূর্ণ। পশ্চিমা ধর্মের ইতিহসে খ্রিস্টীয়, ইহুদীয় এবং মহম্মদীয় ধর্মীয় বিশ্বাসে সহনশীলতার অভাব এবং ঘন ঘন হিংসাশ্রয় যেমন সর্বজনবিদিত, ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান দাঙ্গাও তেমন ইতিহাসের পাতায় নাম লিখিয়ে চলেছে বারবার। আজও পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের শান্তিসহাবস্থান কঠিন রাস্তা পুরোপুরি পার হতে পারেনি। ইংরেজ দেশ ছেড়ে যাবার আগে পূর্ব ও পশ্চিম ভূখণ্ডে ভারতবর্ষের অঙ্গচ্ছেদ করার যে সুযোগ নিল তার বীজ তারা নিজেরাই পুঁতেছিল আগের শতাব্দীতে । একথা ভুলে গেলে চলবে না আলিগড় আন্দে

ালনের পুরোধা সৈয়াদ আহমেদ প্রথম দিকে বলেছিলেন---Hindus and muslims are the two eyes of India-injure the one and you will injure the other. দেশ শাসন করতে ইংরেজের প্রয়োজন ছিল বিভেদ সৃষ্টি করে ফ ায়দা তোলার। তাদের নিজেদের ইতিহাসে ধর্মভিত্তিক বিভেদের নজির তাদের পরিচিত পথ। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত অথবা পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত ধর্মোন্মাদ হতভাগ্য ভারতবাসী নিজেদের ভারতবাসী হিসেবে না দেখে হিন্দু অথবা মুসলমান হিসেবে দেখল। ইংরেজের পাতা ফাঁদে পা দিল। যে পথ দিয়ে হাঁটলে একতা, সার্বিকতা এবং জাতীয়তারর একটা অখণ্ড দৃষ্টান্ত তৈরি করা যেত সে পথ পরিহার করে ঘৃণা ও লজ্জার ইতিহাস রচনা করার পাকা ব্যবস্থা করে দিল। সেই অপরিণামদর্শিতার মাশুল এখনো দিয়ে যেতে হচ্ছে, গুজরাটের সাম্প্রতিক ঘটনায় যার সমর্থন মেলে।

আরও এক মারাত্মক ভাবনার বিষয় জাত-বর্ণ -ধর্মের ছুঁৎমার্গ এবং অসহিষ্ণুতা। পূর্বোল্লিখিত ‘দ্বন্দ্ব’ এবং ‘they’ বোধ থেকে জন্ম নওয়া ‘in group’ এবং ‘out group’ যার বাংলা তর্জমা করলে মিত্রদল এবং শত্রদল গোছের ভাব ফুটে ওঠে। তা আসলে এই অসহিষ্ণুতার নেতিবাচক ফল অথবা সোজা কথায় কুফল। আজকের তথ্য প্রযুক্তির অনায়াস বিচরণের দিনে, পারস্পরিক রাজনৈতিক আদান-প্রদান তথা নির্ভরতার আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জাত-বর্ণ-ধর্মের বিদ্বেষ অনেক বেশি বিধবংসী ভূমিকা নিতে প্রস্তুত। যে কটি প্রতিপক্ষ এই বিদ্বেষের শিকার হয়ে পড়ে তারাকোনো ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে যখন যেখানে মিলিত হয়ে তাদের মধ্যে বিদ্বেষ এবং লড়াইয়ের মনোভাব অব্য াহত থাকে। এমনকী একটি প্রতিপক্ষের বন্ধু বলে চিহিত জাতি বা রাষ্ট্র অন্য প্রতিপক্ষের অথবা অন্যপ্রতিপক্ষের বন্ধু র াষ্ট্রের শত্রুতে পরিগণিত হতে পারে। যেমন ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালের ঘটনা প্যালেস্টাইনের জমির লড়াই, প্যান ইসলামিক সৌহার্দ্য---এররকম অনেক বিষয়ের উপর অঙ্গুলি নির্দেশ করে।

বর্ণসচেতনতা সন্ত্রাসের আরও একটা কারণ। দক্ষিন আফ্রিকা বা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণসচেতনতা অসহিষ্ণুতার কুফল এবং সেও ‘in group’ এবং ‘out group’ বোধজনিত। বলাই বাহুল্য, ধর্মের মতো বর্ণ সম্পর্কিত এই প ারস্পরিক বিদ্বেষও একটা জমাট রাষ্ট্র বা নেশন গড়ে তোলার পক্ষে মস্ত বাধা। সন্ত্রাস যার অবশ্যম্ভাবী ফল। শোর মতে, জন্মের আভিজাত্য নয়, বুদ্ধির প্রাখর্য নয়, মানুষের সদ্‌গুণ, সূক্ষ্ম হৃদয়বৃত্তি, পারস্পরিক বন্ধন, রাষ্ট্র গঠনের মূল ভিত্তি। তাঁর স্বপ্নের রাষ্ট্রের প্রতিটি সভ্য যে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হবে সেই দেশপ্রেম হবে পুণ্যবৎ। তাঁর কথা, ‘How can we live at peace with those, we believe to be damned?”

শোর স্বপ্নের রাষ্ট্রে পৌঁছতে না পারি, যাত্রা অবশ্যই হবে সেই অভিমুখে যদি সন্ত্রাসের প্রতিকার লক্ষ্য হয়।

অর্থনৈতিক বৈষম্য ও ন্যূনতম সুযোগ- সুবিধার অভাব

অর্থনৈতিক বৈষম্য বলতে এমন কথা মাথায় রাখলে চলবে না, ধনী-দরিদ্র-উচচবিত্ত-নিম্নবিত্ত সমাজ থেকে সম্পূর্ণ মুছে যাবে। কিন্তু একদল দুবেলা আধপেটাও খেতে পায় না আর একদল বিলাসিতার আধুনিকতম সরঞ্জামের বা ব্যববস্থার শরিক হতে পারে ইচ্ছেমতো, একই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়---গোলযোগটা এখানেই। অমুক ধনী, আমি গরীব। ততক্ষণ সহ্যের সীমায় থাকে যতক্ষণ অমুকের ধন আর আমার দারিদ্র্যের কারণ হিসেবে কোনো সামাজিক বা অর্থনৈতিক ভ াবনার ত্রুটি বা অন্যায় উলঙ্গভাবে প্রকাশ না পায়। যেদিনই মনে প্রশ্ন এল, এটা কেন, ওটা কেন, কেন এই অবিচার--সেদিন থেকেই মনে ক্ষোভ জন্ম নিল। সে ক্ষোভ প্রথমে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি, পরে গোষ্ঠি বিশেষের প্রতি এবং সবশেষে র াষ্ট্র বিরোধী ঘৃণার চরম প্রকাশে রূপান্তরিত। প্লেটোর রিপাবলিক্-এ উল্লিখিত হয়েছে প্রাচীন গ্রীসের প্রতিটি শহর অর্থে একটি ধনী-শহর, আর একটি দরিদ্র - শহরের যুদ্ধক্ষেত্র। এই যুদ্ধই আমাদের পরিচিত অর্থে সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসদমন বা পাল্টা সন্ত্রাস।

বেঁচে থাকতে হলে যে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন দারিদ্র্য ছাড়া সেইসব প্রয়োজনের অভাবহেতুও ক্ষোভ জন্মনেয়। রবীন্দ্রনাথের পল্লীসেবা থেকে পল্লী প্রকৃতি বিষয়ে সামান্য উদ্ধৃতি প্রাসঙ্গিক হবে। ‘যাদের আমরা ছোটো

করেরেখেছি. তাদের দোহাই দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে অর্থসংগ্রহ করি কিন্তু তাদের ভাগ্যে পড়ে বাক্য, অর্থটা অবশেষে আম াদেরদলের লোকের ভাগ্যেই এসে জোটে। মোট কথাটা হচ্ছে দেশের যে অতি ক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি বিদ্যা ধন মান, সেই শতকরা পাঁচ পরিমাণ লোকের সঙ্গে পঁচানব্বই পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশি। আমরা এক দেশে আছি অথচ আমাদের এক দেশ নয়।' এমন ব্যবধানের অজস্র উদাহরণ সহজেই মেলে এই ভারতবর্ষেরই বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এবং সমগ্র পৃথিবী থেকে। এই ব্যবধান থেকে জন্ম নেয় এক ধরনের পরাধীনতার বোধ যার উর্বর ক্ষেত্রে রস খুঁজে পায় ভবিষ্যৎ সন্ত্রাসের বীজ।

অস্ত্রের ব্যবসা ও আমদানিকৃত সন্ত্রাস

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে জাতি সম্পর্কিত নিরাপত্তার প্র বহু আলোচিত। নিরাপত্তা বিষয়ে মিত্রতার যেসব সূত্রনির্ণয় করা গেছে যার মধ্যে পারস্পরিক সামরিক সাহচর্যের ভূমিকা বিশেষভাবে গুত্বপূর্ণ, সেসবের গায়ে ইচেছমতে া রঙ লাগিয়ে তার চরিত্র বদলে দিতে বাণিজ্যিক খলচাতুরী এবং ধূর্ত অমানবিকবোধের সময় লেগেছে মাত্র কয়েক দশক। সন্ত্রাস সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা যদি নাও বা থাকে, 'সন্ত্রাস যুগ যুগ জিও' ধবজা তুলে ধরে আছে যে, আজকের দুনিয়ার পাশ্চাত্য প্রভাবিত অর্থনীতি এবং ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। The American Prospect, Winter 2002 সংখ্যায় প্রকাশিত বিশ্বায়ন সম্পর্কিত প্রবন্ধে ডক্টর অমর্ত্য সেন উল্লেখ করেছেন বিশ্বব্যাপী অস্ত্র ব্যবসার মধ্যে বিশ্বশক্তিগুলির সংশ্লিষ্ট থাকা অন্যায়। তাঁর মতে সন্ত্রাসবাদ, আঞ্চলিক সংঘাত, সামরিক সংঘর্ষ এগুলো শুধুমাত্র আঞ্চলিক উত্তেজনার সঙ্গে নয়, বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা অস্ত্র ব্যবসার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট। ১৯৯৬ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে বিশ্বের অস্ত্র রপ্তানি ব্যবসার ৮১ শতাংশের অংশীদার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী রাষ্ট্রসমূহ। বিশ্বের মোট অস্ত্র রপ্তানির ৮৭ শতাংশের বিক্রেতা জি-৮ ভুক্ত দেশসমুহ যার প্রায় অর্ধেক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র একাই। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রর অস্ত্র রপ্তানি ব্যবসার ৬৮ শতাংশ উন্নয়নশীল দেশগুলিকে ঘিরে। সম্মিলিত জা তিপুঞ্জের মহাসচিব কোফি আন্নান-প্রস্তাবিত ছোট অস্ত্রের বেআইনি বিক্রয়ের উপর একটিযুগ্ম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আরে াপ, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রর সম্মতি পায়নি।

কেন এই অসম্মতি? সন্ত্রাসবাদ, সংঘর্ষ পৃথিবী থেকে নির্মূল হয় গেলে অথবা লক্ষণীয়ভাবে হ্রাস পেলে অস্ত্র ব্যবসা কিভ াবে চলে ! কথায় কথায় আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশে সামরিক অভ্যুত্থান, এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ধর্ম, বর্ণ, জাতির নামে কাটাকাটি, হানাহানি জারি রাখার আসল তাগিদ এই অসম্মতির মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুট নয় কি ? ইদানীং কালে হ াজার গণ্ডা টিভি চ্যানেলের কল্যাণে ইচেছমতো নির্বাচিত দৃশ্য প্রদর্শনের সাহায্যে রাষ্ট্রেই এর প্রভাবে প্রবল অসন্তোষ আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, এমনকী সন্ত্রাস সৃষ্টি করা সম্ভব যার সুদূরপ্রসারী ফল অবশ্যই অস্ত্রের ব্যবহার। চাহিদা আর যে াগানের সম্পর্ক নির্ণয় অর্থনীতির প্রাথমিক কথা। চাহিদার সৃষ্টি রহস্য অবশ্যই অর্থনীতির পাঠ্য বিষয় নয়। তবে, বাজ ার অর্থনীতি বলে সাম্প্রতিককালে বহু আলোচিত বিষয় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এই চাহিদা সৃষ্টি রহস্যের আবর্তে ঘূর্ণায়মান হলে অবাক হবার কিছু নেই।

সন্ত্রাসের প্রতিকার ---প্রথম পদক্ষেপ

এই পর্যন্ত সন্ত্রাস সৃষ্টির মূলে যে কারণগুলো খোঁজার চেষ্টা করা হল সেই কারণগুলোর উৎপত্তি সন্ত্রাস সৃষ্টির প্রথম পর্যায়। এই কারণগুলোর একটি বা দুটিই দ্বিতীয় পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের জন্ম দেবার পক্ষে যথেষ্ট। এইসা ম্প্রদায়িক মনোভাব তৃতীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর মনে বিজাতীয় বা বৈরী মনোভাব আনে, চতুর্থ পর্যায়ে যার ফলে প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি হিংসার পথ বেছে নেয়। দীর্ঘ মেয়াদে সন্ত্রাসের প্রতিকার করতে হলে যে-কোনো ক্ষোভ ব া অসন্তোষ কোন পর্যায়ে রয়েছে প্রথমেই সেটা বুঝে নিয়ে প্রতিকারের তাৎক্ষণিক উপায় নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বল াই বাহুল্য, সেটা কদাচিৎ ঘটে। ফলত সন্ত্রাসের প্রতিকার প্রায়শই সন্ত্রাস দমন বা পাল্টা সন্ত্রাসে পর্যবসিত হয়।

সন্ত্রাসের প্রতিকার আরও একটি গুদ্বপূর্ণ বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তা হল সন্ত্রাসের ব্যাপ্তি অর্থাৎ সন্ত্রাসকদলের হাত কতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে তার সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা। সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে অনেকেই মনে করছেন এগুলো আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের ইঙ্গিত বহন করে। এমন মনে করার যুত্তি এই, বহু অসন্তোষের প্রকাশ যেমন অঞ্চলকেন্দ্রিক সমস্যা, দাবি-দাওয়া ইত্যাদিকে ঘিরে, অপরাপর ক্ষেত্রে অসন্তোষের চরিত্র ভিন্ন। বহু ক্ষেত্রে সমস্যার প্রসার রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে দেশের সীমা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক রূপ পেতে চায়। আলাদা খলিস্তানের দাবীকে কেন্দ্র করে পাঞ্জাবের সন্ত্রাস অবশ্যই কাশ্মীরের সন্ত্রাসের মতো আন্তর্জাতিক প্রচার পায়নি। ফলে, কাশ্মীরের সন্ত্রাস দমন করতে অনেক বেশি বেগ পেতে হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সমালোচনা, প্যান্- ইসলামিক চোখ রাঙানি, মার্কিন দাদাগিরি অবহেলা করার শত্তি প্রদর্শনে এ দেশ প্রস্তুত নয়। দেশের অর্থনৈতিক বহু বিষয়ে দেশবাসীর ভবিষ্যৎ এখন যত না গুত্বপূর্ণ তার থেকে বেশী গুত্ব পাচ্ছে মার্কিন দুনিয়ার আস্থা অর্জনের প্রচেষ্টা। মোট কথা, সন্ত্রাস যখন বহুজাতিক রূপ পেয়ে যায়, তখন তার প্রতিকার আজকের দিনে অনেক বেশি কষ্টসাধ্য। সুতরাং, অসন্তোষ, ক্ষোভ, খণ্ডবিদ্রোহের সূত্রপাতেই ঝাঁপিয়ে পড়া এবং মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা ও প্রতিকার ছাড়া আজকের দিনে অন্য পথ খুঁজে পাওয়া সন্ত্রাসেরপ্রতিকার বিষয়ে দুষ্কর। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করার অর্থ কতগুলো বিভেদ ও পার্থক্যকে স্বীকার করে নিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। গোঁড়ামিটা এ বিষয়ে অহিষ্ণুতাতেই এবং গোলমালের সূত্রপাত এখান থেকেই। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'যেখানে যথার্থ পার্থক্য আছে সেখানে সেই পার্থক্যকে যথাযোগ্য স্থানে বিন্যস্ত করিয়া, সংযত করিয়া, তরে তাহাকে ঐক্যদান করা সম্ভব। সকলেই এক হইল বলিয়া আইন করিলেই এক হয় না। যাহারা এক হইবার নহে তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনের উপায়---তাহাদিগকে পৃথক অধিকারের মধ্যে বিভত্ত করিয়া দেওয়া। পৃথককে বলপূর্বক এক করিলে তাহারা একদিন বলপূর্বক বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সে বিচ্ছেদের সময় প্রলয় ঘটে। ভারতবর্ষ মিলন সাধনের এই রহস্য জানিত। ফরাসি বিদ্রোহ গায়ের জোরে মানবের পার্থক্য রত্ত দিয়া মুছিয়া ফেলিবে মনে স্পর্ধা করিয়াছিল, কিন্তু ফল উলটা হইয়াছে----'

রবীন্দ্রনাথের অভিমত মেনে নিয়ে যদি এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় যখন বিভেদ এবং পার্থক্য সত্ত্বেও একটা সার্বিক ঐক্যের বন্ধন তৈরি করা যাবে তখনই সত্যি সত্যি সন্ত্রাসের গোড়া কেটে দেওয়া সম্ভব হবে।

শিক্ষার গুত্ব

শিক্ষাত্রমে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির অনুপ্রবেশ, বিদ্ধ প্রবণতা এবং টানাপোড়েন শিক্ষাকে অখণ্ড নেশন গড়ার লক্ষ থেকে বহুদূরে সরিয়ে রাখে। রাজনীতিমুত্ত শিক্ষাই একাধারে শিক্ষার্থীর আসল শিকড় ও স্থানীয় ইতিহাস সম্বন্ধে তাকে সচেতন করতে পারে আবার জাতীয়তাবোধ বা দেশপ্রেমের বোধ তার মধ্যে জাগ্রত করতে পারে। এই জাতীয়তাবোধ চাপিয়ে দেওয়া জাতীয়তাবোধ হবে না। বংশানুত্রমিকভাবে শিক্ষা সুস্থভাবে এ কথাই প্রচার করবে, প্রতিটি দেশবাসী যে বৃহত্তর জাতীয় গোষ্ঠীর সদস্য তার অন্তর্ভুত্ত ছোট বা আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রভেদ সামান্য, মিল এত বেশি যে, পারস্পরিক শ্রদ্ধার বিনিময়ে স্বাভাবিকভাবেই একটি বিশেষ ও বৃহত্তর জাতীয়তাবোধের স্রোতস্বিনী নদীতে সকলের সদা-অবগাহন সম্ভব। সে অবগাহন স্ব-ইচ্ছায়, দেশের শরিক হবার অধিকারবোধ, কর্তব্যের টানে এবং সর্বোপরি নিরাপত্তা জীবনধারণের সামাজিক তথা সার্বিক প্রয়োজনে। ভারতবর্ষের প্রসঙ্গে বলা যায়, শিক্ষাত্রমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীর প্রাদেশিক ভাষা ও তথ্য সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণের সঙ্গে একটি সর্ব ভারতীয় জাতীয় শিক্ষা গ্রহণেরপ্রয়োজন, যাতে শিক্ষার্থী সমগ্র ভারতবর্ষকে মানসিকভাবে তার নিজের দেশ বলে মনে করতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, অঞ্চলভিত্তিক রাজনৈতিক দল ত্রমশ শত্তিশালী হয়ে ওঠায় এবং শিক্ষার মতো গুত্বপূর্ণ বিষয়েও রাজনীতির পথ পরিহার করতে কোনো দলই প্রস্তুত না থাকায়, একটি গ্রহণযোগ্য জাতীয় শিক্ষাত্রম তৈরি করার পথ আজকের ভারতবর্ষে সহজলভ্য নয়।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে ছাত্রাবস্থায় পরিচিতি

'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাবণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'ছাত্রগণ যদি স্ব স্ব প্রদেশের নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে সমস্ত ধর্মস

ম্প্রদায় আছে তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তবে মন দিয়া মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার যে একটা শিক্ষা তাহাও লাভ করিবেন এবং সেই সঙ্গে দেশেরও কাজ করিতে পারিবেন।' এ প্রসঙ্গে আমাদের পাঠক্রমে কিছু বিষয়ের অন্তর্ভু ক্তি প্রয়োজন। যেসব মানুষ প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে উদাসীন, মাধ্যমিকস্তর থেকে স্ন াতক স্তর পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের তাদের দোরগোড়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হোক আবশ্যিকভাবে। প্রতিবার একমাস হিসেবে স্ন াতক স্তর পর্যন্ত মোট তিনমাস প্রতিটি ছাত্রছাত্রী তাদের পাঠক্রমের আবশ্যিক বিষয় হিসাবে এই কাজে যোগদান করতে বাধ্য থাকবে। ছাত্রছাত্রীরা এই বাধ্যতামূলক কাজে সংযুক্ত হলে নিজেদের পরিচিত গণ্ডীর বাইরে বৃহত্তর সমাজব্যবস্থার প্রকৃত অবস্থান সম্বন্ধে জানতে শিখবে। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাদের পাঠাতে পারলে ছাত্র াবস্থা থেকে বিভিন্ন শ্রেণী ও বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সঙ্গে তাদের ব্যবহারিক আদান-প্রদানের সুযোগ হবে এবং নির্দিষ্ট স ম্প্রদায়ের মধ্যে আটকে পড়ে না থেকে মানুষের পক্ষে বৃহত্তর গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবেনিজেকে মনে করার পথ প্রশস্ত হবে। ছাত্রছাত্রীদের জন্যে এই ফিল্ড ওয়ার্ক সুপারিশ মূল্যায়ন করার জন্যে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পাঠক্রম এবং পরীক্ষার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন, যাতে এই ফিল্ড ওয়ার্ক নিতান্ত হুল্লোড় পরিণত না হয়।যদিও প্রাসঙ্গিক নয় তবু উল্লেখ করা যেতে পারের সরকারের অর্থাভাবে যদি প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে বিঘ্ন ঘটেথাকে, এই ফিল্ড ওয়ার্ক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সাময়িক পরিবর্ত-ব্যবস্থাও হয়ে উঠতে পারে।

সংস্কৃতির ভূমিকা   সরকারি ও বেসরকারি

সুস্থ শিক্ষা বিতরিত হলে সংস্কৃতিরও সুস্থ প্রকাশ ঘটবে, এটাই স্বাভাবিক। যে যে মাধ্যম সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে সাহায্য করবে সে প্রিন্ট মিডিয়াই হোক অথবা অডিও ভিস্যুয়াল ইলেক্টনিক মিডিয়া---জাতীয় স্তরে সেই সেই মাধ্যমের প্রস ারের জন্যে সরকারি, বেসরকারি সব রকম প্রচেষ্টা দরকার। এ ছাড়াও জনসংযোগের ভূমিকা এক্ষেত্রে অতি গুত্বপূর্ণ। সংস্কৃতি বিকাশের পথ মূলত প্রচারধর্মী। কিন্তু প্রচার অভিযানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রায়শই যে মিথ্যে ও একপেশে নীতি স্থান পায় সে বিষয়ে সচেতন থেকে সুস্থ সংস্কৃতির বিষয়ে প্রচারকে রাজনীতিমুক্ত রাখার প্রয়োজন। মিথ্যে প্রচারের মাধ্যমে ক্ষণস্থায়ী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের পথে পা না বাড়িয়ে সত্য তথ্য তুলে ধরা প্রয়োজন। দরিদ্রকে--- তোমার জন্যে ঢ ালাও ব্যবস্থা করা রয়েছে, না বুঝিয়ে যদি সত্যি সত্যি যেটুকু রয়েছে তার প্রচার করা হয় এবং যদি প্রচার ও সরকারের কাজের মাধ্যমে সার্থকভাবে একটু বোঝানো যায় ধনী এবং দরিদ্রের নাগরিক অধিকারে বৈষম্য নেই, তবে আর্থিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক প্রশাসন ভবিষ্যৎ সন্ত্রাস সৃষ্টির কারণ না হবার সম্ভাবনা।

প্রচারের আর একটা দিক জুড়ে থাকবে জাতি এবং ধর্মভেদকে ঘিরে শিক্ষা। এমন একটা সংস্কৃতির আবহাওয়া গড়েতে ালা দরকার যাতে দেশবাসী জাতি এবং ধর্ম বিষয়ে উদাসীন হতে পারে। জনসাধারণ এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের একট া সদর্থক ভূমিকা এ প্রসঙ্গে গুত্বপূর্ণ। শিক্ষিত মানুষ ছোট দল গড়ে অথবা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাত্রা, পথন াটক বা অন্য উপায়ে যদি ঈশ্বর বিষয়ে মানুষের অহেতুক ভক্তি ও ভীতি কমাবার প্রয়াস নেয়, ভক্তি ব্যবসায়ীদের বিদ্ধে যুক্তিগ্রাহ্য প্রচার কার্য চালায় এব সেই প্রচারকার্যে যদি বিভিন্ন শ্রেণী, ধর্ম, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মানুষকে দলভুক্ত করে নিতে পারে, তরে এমন দিন আসা সম্ভব যখন 'যত মত তত পথ' আবৃত্তি করে ধর্মান্ধ, পথভ্রষ্টমানুষকে সামলাতে হবে ন া। ঈশ্বরবিষয়ে অনাগ্রহ পরিচিত অর্থে বিশেষ বিশেষ ধর্ম-বিষয়ে মানুষকে অনাগ্রহী করে তুলবে। ধর্মের নতুন অর্থ ম ানুষের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হবে। ভবিষ্যৎ ঐক্যের পথ এবং শোর কথামতো ধর্মীয় দেশপ্রেমের পথ সুদৃঢ় হবে।

বিবাহের ব্যাপারে জাতি, ধর্ম ভাষা ইত্যাদির ব্যূহ ভাঙার একটা সুপরিকল্পিত নীতি খুবই কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে। সেটা সম্ভব হয় যদি যুবক-যুবতী সহজে সরলভাবে অন্য সম্প্রদায়ের বা অন্য ভাষাভাষী যুবক -যুবতীর সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ পায়। সরকারি, বেসরকারি প্রচার মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে এ কথা তুলে ধরা প্রয়োজন, যে কেউ অন্য স ম্প্রদায়ের, অন্য জাতে, অন্য ধর্মে বা অন্য প্রদেশীয়র সঙ্গে বিবাহসূত্রে সম্পর্কিত হলে কোনোভাবেই তাকে সামাজিক অন্যায় বলা চলবে না। এক কথায় এমন একটা সাস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে হবে যার মূল লক্ষ্য হবে বৃহত্তর ক্ষেত্রে

অবাধ মেলামেশার প্রয়োজন সম্পর্কিত শিক্ষা বিতরণ।

রাজনীতিবিদদের ভূমিকা

শিক্ষা-সংস্কৃতি, জনসংযোগ, গণমাধ্যম ইত্যাদি সন্ত্রাসের প্রতিকারে কাজে লাগাতে গেলে ভারতবর্ষের মতো গণতান্ত্রিকক কাঠামোয় রাজনীতিবিদ্‌দের বাদ দিয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে কিছু করা অসম্ভব। রাজনীতিবিদ্‌রাই সরকার চালান কিংবা বিরোধী হিসাবে সরকারের ভুল ত্রুটি নিয়ে সমালোচনা করে প্রশাসনে প্রভাব বিস্তার করেন। শিক্ষা - সংস্কৃতি ইত্যাদির প্রয়োগে কীভাবে সন্ত্রাসের মূল ধরে নাড়া দেওয়া যায় সে পথ বিশেষজ্ঞরা বাতলাতে পারেন কিন্তু রাজনীতিবিদ্‌দের পৃষ্ঠপোষকতা এবং সাগ্রহ কর্মকাণ্ড ব্যতীত সেসবের বাস্তব প্রয়োগ প্রায় অসম্ভব।

এ তো গেল রাজনীতিবিদ্‌দের সদর্থক ভূমিকা যা ভবিষ্যৎ সন্ত্রাস অঙ্কুরে বিনাশ করার সহায়ক। অন্যদিকে রাজনীতিবিদ্‌দের যেসব নঞর্থক দিক আছে যার ফলশ্রুতি বিভেদবৃদ্ধিতে, তার বিলুপ্তি বিষয়ে রাজনীতিবিদ্‌দের সচেতন করে দেবার দায়িত্বও বিদ্ধবাদী রাজনীতিবিদ্‌দেরই। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়। মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার পৌরোহিত্যে তামিলনাড়ুতে সিদ্ধান্ত হয়ে গেল সরকারি অনুমতি ব্যতিরেকে ধর্মান্তর নিষিদ্ধ। এটা কাকচক্ষুরমতো পরিষ্কার, ধর্ম নিয়ে সরকারের এই মাথাব্যথার পিছনে আছে ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ফায়দার পাটিগণিত। জয়ললিতার এ হেন সিদ্ধান্ত বদল করবে কে ? নিশ্চয়ই ঝাণ্ডা নিয়ে সাধারণ মানুষ রাস্তায় নামবে না এবং কোনোদিন তেমন পরিস্থিতি ভারতবর্ষে যদি আসে তাহলে অনেক চিন্তার অবসান স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই হয়ে যাবে। যাই হোক্‌, প্রতিবাদটা আজকের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পটভূমিকায় বিদ্ধ রাজনৈতিক কোনো দলই করবে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। সে প্রতিবাদ সত্যিই মানুষের সার্বিক মঙ্গলের কথা ভেবে হতে পারে হয়তো, হয়তো বাপাল্টা প্রচাররূপে অন্যভাবে অন্য রাজনৈতিক ফায়দার কথা মাথায় রেখে। মোটের উপর দেশের ঐক্যকে সুদৃঢ় করতে বিভেদ-বিদ্বেষ দূর করার যে-কোনো স্তরের কর্মসূচিতেই রাজনীতিবিদ্‌দের ভূমিকা ও গুত্ব অপরিসীম।

সন্ত্রাস প্রতিকারে সাংবিধানিক ও আইনগত দিক

সংবিধান ও সংশ্লিষ্ট আইনের নিয়মিত পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় এবং দেশের নাগরিকদের সমান অধিকার ও দায়িত্ব সুনিশ্চিত করতে বিশেষ প্রয়োজনীয়। সংবিধানের যে যে বিষয়গুলি সমসাময়িকতার প্রশ্নে অপ্রয়োজনীয় তাদের বাতিল করা এবং নতুন নতুন প্রয়োজনীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা জরি। যেমন, তপসিলী জাতি ও আদিবাসীর সংরক্ষণ বিষয়ে কিছু নতুন ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজন। একটু খোঁজ নিলেই জানা যাবে, রাজস্থানের ‘মিনা’ বা পশ্চিমবঙ্গের ‘নমশূদ্র’ সম্প্রদায়ের মতো কিছু কিছু সম্প্রদায়ের শিক্ষিত মানুষ তপসিলী জাতির জন্যে সংরক্ষিত উচ্চপদে যতটা অধিষ্ঠিত তপসিলী জাতিসমূহের বাকি সম্প্রদায়গুলো তুলনায় অনেক পিছিয়ে। একই রকমভাবে মিশনারীদের কাছাকাছি থাকার সুবাদে অন্য বহু আদিবাসীদের তুলনায় বেশি আলোকপ্রাপ্ত হওয়ায় সাঁওতালীরা সংরক্ষণের বাড়তি সুযোগ পেয়ে যান যেটা অন্য আদিবাসীদের মানুষ পাননা। আসলে সংরক্ষণের প্রাথমিক সুযোগ ভোগ করতে শু করার পর থেকে এইসব সম্প্রদায়ের মানুষ পুরো পরিবারসহ ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষণের সুযোগ পেতে থাকেন। মনে রাখতে হবে, তপসিল বানানোর পিছনে গুত্বপূর্ণ ভাবনা ছিল দারিদ্র্য। সুতরাং,সেই কথা মাথায় রেখে এমন একটা সংশোধনী প্রস্তাব আনার প্রয়োজন যাতে চাকরি ক্ষেত্রে একবার যিনি সংরক্ষণের সুযোগ পেয়ে গেছেন তিনি বা তাঁর কোনো সন্তান যেন সংরক্ষণের সুযোগ আর না পান। কারণ, একবারের সুযোগে তিনি উচ্চবর্ণের লোকদের সমান প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছেন। তাঁর বা তাঁর পরিবারের জন্যে সংরক্ষণের দরজা বন্ধ করে দেওয়ার অর্থ তপসিলভুক্ত জাতি বা আদিবাসীদের অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে সংরক্ষণের সুযোগকে বেশিমাত্রায় পৌঁছে দেওয়া। এইভাবে অবহেলিত সমাজকে সত্যি সত্যি প্রতিষ্ঠিত হবার কিছু সুযোগ দেওয়া যাবে।

দারিদ্র্য তপসিল বানানোর ভিত্তি ধরে নিলে অন্য ধর্মের দরিদ্র সম্প্রদায়ের মানুষকে কীভাবে সংরক্ষণের আওতায় অ

ানা যায় সে নিয়েও একটা নিরপেক্ষ বিচার হওয়া দরকার। জাত-ধর্ম নির্বিশেষে সংরক্ষণ তৃণমূল স্তরে ছড়িয়ে দিতে পারলে ভবিষ্যতের বহু কন্টকবৃক্ষের বেড়ে ওঠার পথে প্রকৃত বাধার সৃষ্টি হবে। আর একটি প্রশ্ন, সংখ্যালঘু শব্দটিকে কেন্দ্র করে। ভারতীয় সংবিধানের ১৫ (১) এবং ১৫ (২) ধারা দুটিতে বলা আছে, রাষ্ট্র ধর্ম-সম্প্রদায়-জাত -লিঙ্গ-জন্মস্থানভেদে নাগরিকদের মধ্যে কোনো বৈষম্য দেখাবে না এবং সর্বসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত সব স্থানে প্রবেশের অধিকার বা সেসব স্থান ব্যবহারের অধিকার সব নাগরিক সমানভাবে পাবেন। নাগরিকদের মধ্যে যদি ভেদ না থাকেতবে আবার ৩০ (১) ধারায় ধর্মের বা ভাষার বিচারে সংখ্যালঘু বলে একটা তকমা স্থান পেল কেন? সংখ্যালঘু বলার অর্থই যেন একদলকে সতর্ক করে দেওয়া। এ দেশে তোমরা আলাদা সম্প্রদায়। অর্থাৎ তাদের মনের মধ্যে একটা ভীতির সঞ্চার করে দেওয়া। তাদের জন্যে বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকা দরকার। এই ধরনের তকমা প্রয়োগে সবনাগরিকের প্রতি রাষ্ট্রের বৈষম্যহীন বা পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গির অঙ্গীকার হাজার প্রশ্নের মুখোমুখি এসে পড়ে। সংখ্যালঘু নামক বিশেষ পরিচিতি এই শ্রেণীভুক্ত মানুষের পক্ষে অত্যন্ত সম্মানহানিকর কারণ তাদের বিশেষ কোনো নিরাপত্তা দেবার পরিবর্তে সংখ্যাগরিষ্ঠের একাংশের বিরাগভাজন করে তোলা হয়েছে যার সমর্থন ইদানীংকালের ঘটনাপ্রবাহ থেকেই মেলে।
সংবিধানে এই প্রয়োজনীয় সংশোধনগুলো অখণ্ড রাষ্ট্র গড়ার পক্ষে উপযুক্ত হবে। মানুষের মনের ছোট ছোট ক্ষোভ একসময় দাবানলের জন্ম দেয়। সে পর্যন্ত অপেক্ষা করা বিপজ্জনক।
সাংবিধানের সঙ্গে সঙ্গে আইনগত দিকের ভূমিকাও গুত্বপূর্ণ। তাত্ত্বিক নিয়ম করলেই ব্যবহারিক প্রয়োগ সঠিক হয় না। আইনের অনুশাসন এ ব্যাপারে ঠিক ঠিক ব্যবহারিক প্রয়োগের পথ সুদৃঢ় করে। নিয়মভঙ্গের অপরাধে শাস্তিবিধান অত্যন্ত জরি। তাই রাষ্ট্রের সার্বিক লক্ষ্যের নিকে নজর দিয়ে আইন প্রণয়ন এবং আইন জারী রাখার গুত্ব অপরিসীম।

আরক্ষা ও সামরিক নীতি

এ পর্যন্ত যা আলোচনা হল তার মূল লক্ষ্য ছিল সন্ত্রাসের জন্ম নেবার সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান করে যথাযথ প্রতিষেধক খোঁজ এবং প্রয়োগ করা। একটা কথা মেনে নিতেই হবে, শারীরিক রোগ নির্মূল করার প্রতিষেধক আবিষ্কারের মতো বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং প্রয়োগ কোনো সামাজিক ব্যাধির প্রতিষেধক নির্ণয়ে সম্ভব নয়। সুতরাং, হাজার চিন্তা-ভাবনা করে কোটি কোটি মানুষ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েও সন্ত্রাসের প্রতিষেধক বহু ক্ষেত্রে কাম্য লক্ষ্যে পৌঁছতে অসমর্থ হতেই পারে। তাই সন্ত্রাস এসে পড়লে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্যে উপযুক্ত আরক্ষা ও সামরিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

সন্ত্রাস দমনে আরক্ষা ও সামরিক নীতি যে-কোনো সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর চোখেই হয়ে উঠবে পক্ষপাতহীন এবং মানবিক। একই সঙ্গে প্রতিকূল অবস্থার সামাল দিতে অত্যন্ত তৎপর। সন্ত্রাস দমন করতে সন্ত্রাস বলে চিহ্নিত আত্মীয়-বান্ধবদের হেনস্থা করা অথবা দমননীতির সঙ্গে ফাউ হিসাবে এসে পড়া অকারণ অত্যাচার, অগ্নিসংযোগ এমনকী নারীর চরম অসম্মান কাগজে-কলমে নীতিবহির্ভূত হলেও বাস্তবে অনুপস্থিত নয়। এ বিষয়ে দৃষ্টিপাতে প্রশাসন উদাসীন থাকলে সেটাও নীতিরই ত্রুটি বলে মেনে নিতে হবে। সন্ত্রাস-দমননীতি প্রণয়নে যেমন সরকারের ভূমিকা থাকবে তেমনি বিভিন্ন শাখার গুণিজনদের মতামত গ্রহণ করাও যুক্তিযুক্ত। দমননীতি তাতে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গঠিত বলে জনসমর্থন পাবে। দমননীতিতে সন্ত্রাসবাদী যেমন কঠোর শাস্তি পাবে তেমনি শাসকগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নীতিবহির্ভূত ব্যক্তিগত অমানবিক কাজে তাদের উপযুক্ত সাজা দেবার ব্যবস্থা থাকবে। দ্বিতীয়টা যদি মানবাধিকার কমিশনের হাতে থাকে তবে মানবাধিকার কমিশনকেই আরও শক্তপোক্তভাবে গড়া হোক।

উপসংহার

সবশেষে একটা কথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন। আপৎকালীন আরক্ষা ও সামরিক নীতি সন্ত্রাস দমনে কখনো স্বল্প মেয়াদে প্রযুক্ত হলেও, সন্ত্রাসের প্রতিকারে তা সার্থক ব্যবস্থা হতে পারে না। সন্ত্রাসের শিকড় ধরে নাড়া দিয়ে মাতৃভূমি সন্ত্রাসবীজমুক্ত রাখার ধারবাহিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলেই কাঙ্ক্ষিত পথদর্শন।